International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 6, 438-439
June 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

চেতনা মুখাৰ্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

Correspondence:
চেতনা মুখাৰ্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

সাঁচী অভিলেখে দামোদরপুর তাম্রশাসন, মান্দারসোর অভিলেখে প্রতিফলিত গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক চিত্র

চেতনা মুখাৰ্জ্জী

অভিলেখ শব্দটি ইংরাজীতে Epigraphy অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রীকভাষায় Epigraphy শব্দের অর্থ 'to write on' এখানে চ্যব্রদ্মণ বা 'epi' এর অর্থ on, upon, over, above এবং graphein এর অর্থ 'to write' এই epigraphein শব্দ থেকে ইংরাজী epigraphy শব্দ উদ্ভূত। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হল এই অভিলেখ। যার সাহায্যে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে নানাভাবে জানতে পারি।

গুপ্তপূর্ব যুগে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে গতিবেগের সঞ্চার হয়েছিল, গুপ্ত যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিকে তার সমাপ্তি পর্ব বলা যায়। এই যুগে আমদানি-রপ্তানির জন্য স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রবন্দরগুলি ব্যবহৃত হত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে কসমাস বন্দর হিসাবে সিন্ধু, পশ্চিম উপকূলে কল্যাণ এবং চৌল, দক্ষিণে কাবেরীপত্তনম্ এবং পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রপথ ছাড়া চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের জন্য দুইটি স্থল পথ ছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঁচী অভিলেখের ভিত্তিতে আমরা প্রথমে পর্যালোচনা করব। এটি একটি বৌদ্ধ অভিলেখ। এতে গ্রাম বা ভূমিদানের কথা রয়েছে। দেয় গ্রাম বা অঞ্চল ঈশ্বরবাসক নামে উল্লিখিত। প্রাসঙ্গিক অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত বলে ঐ ঈশ্বরবসাকের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায় না। এছাড়া এখানে ২৫ দীনারের একটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এই দান করেছেন উন্দান পুত্র আম্রকার্দব। আম্রকার্দব ২৫ দীনার আর্যসঙ্ঘকে স্থায়ী আমানত বা ফিক্সড ডিপজিট হিসাবে দান করছেন। এই আমানত থেকে যা বৃদ্ধি বা সুদ পাওয়া যাবে তার অর্ধেক ব্যয় হবে প্রতিদিন পাঁচজন ভিক্ষুকে ভোজন করানো ও রত্নগৃহে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য। এই দুটি কাজ শাশ্বতকালীন অর্থাৎ বারবার করে যেতে হবে।

আমানতের সুদের অপর অর্ধাংশ, যা সম্ভবতঃ আম্রকার্দবের নিজস্ব ছিল, তাও অনুরূপ কার্যের জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২৫ দীনার আমানতের সুদ থেকে প্রতিদিন মোট দশ জন ভিক্ষুর আহার ও দুটি প্রদীপের তেলের ব্যয় নির্বাহ হত। মূলধন খরচ করার অধিকার দান প্রাপকের ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে আর্যসঙ্ঘ যেন আধুনিক কালের স্থায়ী আমানত রক্ষার ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্টি এই দুয়ের ভূমিকা পালন করত। এ প্রসঙ্গে রাধাকুমুদ মুখার্জীর প্রাজ্ঞ মন্তব্য উদ্ধার করছি১ -- "The Samgha is here thus functioning as a bank of deposit and also as a trustee, holding in safe custody and in Perpetuity, a fund in aid of the benificiaries fixed by the donor, while keeping the corpus of the donation intact."

বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক বলতে যা বোঝায় যেরকম কোন প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ভারতে ছিল না। প্রতিষ্ঠান হিসাবে গিল্ডগুলি ব্যাঙ্কের কাজ করত। গিল্ড আমানত গ্রহণ করত এবং ধার দিত। রাজা অথবা স্থানীয় কর্মচারীরা কৃষকদের ঋণ দিতেন। বড় মন্দিরগুলি অনেক সময় মহাজনের ভূমিকা গ্রহণ করত।

গুপ্তযুগে ধর্মীয় সঙ্ঘগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তারা ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্টি এই দুয়ের ভূমিকা পালন করত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করে সুরাষ্ট্র এবং গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধুমাত্র সীমান্ত সম্প্রসারণ তাঁর এই কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জানতেন যে এর ফলে তিনি পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে সরাসরি প্রবেশ করার অধিকার লাভ করবেন। পশ্চিম ভারতে তখন বৃহত্তম বন্দর ছিল বারিগাজা।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকে মুদ্রা শক-কুষাণ মুদ্রা রীতি থেকে উদ্ভূত। তৎকালীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য। এগুলি নিঃসন্দেহে পরিমার্জিত এবং সৌষ্ঠবপূর্ণ। এ যুগের প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে বিলাস সামগ্রী বিষয়ক বাণিজ্য তখন অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই ধারা বেশিদিন অক্ষুণ্ণ ছিল না। সাম্রাজ্য শক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত যুগের মুদ্রামানেরও নিম্নগতি সূচিত হয়েছিল। এর স্বকীয় মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। গুপ্তযুগের মুদ্রা সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য সে যুগের রৌপ্য মুদ্রার কোন সঞ্চিত ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়নি। এযুগের ঋণ ব্যবস্থা এবং সুদের হার সম্পর্কিত তথ্য স্মৃতিশাস্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে নূতনত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গুপ্তযুগে এ বিষয়ে মনুর বিধানই অনুসরণ করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল।

এ যুগের অর্থনীতিতে বৌদ্ধসঙ্ঘ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। প্রচুর ধন সম্পদের অধীশ্বর হয়ে এই সঙ্ঘ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। তাছাড়া কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধ সঙ্ঘ-সুদের বিনিময়ে মানুষকে ঋণ দিত। সাঁচী অভিলেখে উল্লিখিত আর্য সঙ্ঘে কিছু এই ধরণের কার্যাবলীই প্রতিফলিত হত।

এরপর আমরা চলে আসি প্রথম কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে। প্রথম তাম্রশাসনটি প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে ১২৪ গুপ্তাব্দে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয়টিও প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে ১২৮ গুপ্তাব্দে প্রচারিত। এই দুটি তাম্রশাসনই ভূমি বিক্রয়ের দলিল। প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে ১২৪ গুপ্তাব্দের ৭ই ফাল্গুন কর্পটিক নামে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র যাগ নিষ্পাদনের জন্য তিন দীনার মূল্যে ডোঙ্গা নামক এলাকার উত্তর পশ্চিম দিকে এক কুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করেছেন। দ্বিতীয়টিতে ১২৮ গুপ্তাধর ১৩ই বৈশাখ একজন ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঐরাবতগো রাজ্যের পশ্চিমে এক কুল্যবাপ ভূমি তিন দীনার এই হিসাবে দুই দীনার দিয়ে ৫ দ্রোণবাপ বা ২/৩ কুল্যবাপ ভূমি ক্রয় করছেন।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে জেলা প্রশাসনের সদর দফতরকে বিষয়াধিষ্ঠানাধিকরণ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়শাসকের সাহায্যের জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি বা পরিষদ ছিল। এই পরিষদে থাকতেন নগরশ্রেষ্ঠী (নগরের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা প্রধান, Guild President), সার্থবাহ (বণিকদের প্রতিভূ,Caravan Merchant), প্রথম কুলিক (কারিগর, Chief Artisan)। রণবীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন এঁদের মধ্যে কেবল প্রথমকায়স্থই সাক্ষাৎভাবে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক পুরুষ ছিলেন। তিনি দলিলপত্র লিখতেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরূপে রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁরাও যে স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতেন সেটা তৎকালীন প্রশাসনের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে পশ্চিম ভারতের চৌথিয়া-র সঙ্গে এই পরিষদের কর্মপদ্ধতির সাদৃশ্য অনুমান করা যায়। তিনি বলেছেন১ -- '..... the chairman is the Nagarseth and the Patel (Village headman) and Patwari are members.'

এরপর আমরা চলে আসি রেশম গোষ্ঠীর মান্দাসোর অভিলেখে। লাটদেশ থেকে পট্টবায় অর্থাৎ রেশমশিল্পীদের একটি গোষ্ঠী দশপুর নগরে এসে বসতি করে। ঐ সময় প্রথম কুমার গুপ্তের সামন্তরাজা বন্ধুবর্মা। দশপুর শাসন করছিলেন। পট্টবায় শ্রেণীরা লাট (গুজরাত) দেশ থেকে দশপুরে তাদের পূর্বপুরুষানুক্রমিক পট্টবায় বৃত্তি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দশপুরে এসে তারা পুরুষানুক্রমিক পট্টবায় বৃত্তি ত্যাগ করে অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। নিজ নিজ বংশের যোগ্যতা অনুসারে সঙ্গীত, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষকেও নিজেদের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে কেন তারা পট্টবায় বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। A.L.Basham বলেছেন -- কেবল রেশমশিল্পকে আশ্রয় করে জীবনযাত্রানির্বাহ করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। আবার এমন হওয়াও সম্ভব যে পশ্চিম ভারতে সেই সময় বর্ণধর্ম খানিকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল বলে সবসময় বর্ণধর্মানুসারে শাস্ত্রবিহিত জীবিকাগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না।২

এই বৃত্তি বদলের প্রসঙ্গে রণবীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, প্রথমতঃ এই জাতীয় বৃত্তি বদলের নজীর শ্রেণীর সংগঠনের পক্ষে শুভ হয় না, পেশাগত ঐক্যই শ্রেণীর সাফল্যের অন্যতম কারণ। তার উপর রেশম উৎপাদন ত্যাগ করে 'শ্রেণী'-র কিছু কিছু সদস্য যেসব বৃত্তি নিলেন, তা সরাসরি ধনোৎপাদক বৃত্তি নয়। তাহলে বুঝতে হবে যে পশ্চিম ভারতে পঞ্চম শতকের দ্বিতীয় পাদে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনও সংকট দেখা দিয়েছিল। যার ফলে একটি শ্রেণী তার স্থায়ী এলাকা ত্যাগ করে ও তার সদস্যদের একাংশ হঠাৎ বৃত্তি বদল করেন। এখানে আরেকটি প্রশ্ন খুব জরুরি। অন্য বৃত্তি আশ্রয় করায় তারা আর শ্রেণীসভ্য থাকতে পেরেছিল কিনা। কেউ কেউ মনে করেন তাদের সভ্যপদ আর বলবৎ ছিল না। অন্যেরা বলেন জীবিকার তারতম্য সত্ত্বেও তাদের শ্রেণী সংহতি অক্ষুন্ন ছিল। লক্ষণীয়, কোনো কোনো সভ্য স্বজাতির চেয়ে সামাজিকভাবে উন্নততর বর্ণেরও বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। রোমিলা থাপার এর মধ্যে উপবর্ণগুলির সামাজিক ঊর্ধ্বগতির ইঙ্গিত পেয়েছেন। কে.কে. থাপলিয়াল অবশ্য মনে করেন আপদ্ধর্মবশতঃ এমনটা হয়েছিল। তিনি এমনও ধারণা উপস্থাপিত করেছেন যে, রেশন বয়ন ছাড়াও এই শ্রেণী তার বিচিত্র কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক লোককে নিয়োগ করেছিল। এই উদ্বৃত্ত সভ্যগণ নানারকম বৃত্তি আশ্রয় করেছিল। কিন্তু তারা যে শ্রেণী চরিত্রকে আদৌ ক্ষুণ্ণ হতে না দিয়ে তাকে অবিকল বজায় রেখেছিল, তার প্রমাণ এই অভিলেখ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রেশম বয়ন শিল্পের উপর এই অভিলেখ আলোকপাত করে। ভারতবর্ষে পট্টবয়নশিল্প সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন। পট্টবায় শ্রেণী লাটদেশ থেকে দশপুরে এসেছিল।

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় শ্রেণীসমূহের কার্যকলাপও এই অভিলেখ থেকে জানা যায়। ভারতবর্ষের এই অভিলেখ থেকে জানা যায়। ভারতবর্ষের শিল্প, কারুকর্ম, প্রভৃতির উন্নতি বহুলাংশে শ্রেণীগুলির উপর নির্ভর করত। শ্রেণীর আশ্রয়েই কোন শিল্পী নিজের শিল্পনৈপুণ্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারত। গুপ্তযুগে এই শ্রেণীগুলি ছিল দৃঢ়ভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান। রেশমশিল্পীরা সমুদ্রোপকূলের বাণিজ্যানুকূল স্বভূমি পরিত্যাগ করে বহুদূর মালবদেশে এসে বসতি করল। অভিলেখ থেকে এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেলে না। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের অনুমান এই রকম। লাটদেশের সমৃদ্ধ মূলতঃ পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গে সমুদ্রবাণিজ্যের উপর নির্ভর করত। রেশম শিল্পীরা তাদের সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র বিদেশে পণ্যরূপে প্রেরণ করত। কিন্তু কালে কালে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল এবং তার ফলে সমুদ্রবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। বার বার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তার ফলে সোনা দুর্লভ হয়ে পড়ল। স্বভাবতঃ ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যও তার প্রভাব এড়াতে পারল না। আবার বাইজান্টীয়রা যখন নিজেরাই রেশম উৎপাদন করতে সমর্থ হল তখন স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সেই রমরমা আর থাকল না। রোমিলা থাপার বলেছেন মধ্য এশিয়ার স্থলপথ আর সমুদ্রপথের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনদেশ এত সুগম হয়ে ওঠে যে ভারতবর্ষে চীনাংশুকের আমদানি খুবই বেড়ে যায়। ফলে মহার্ঘ ভারতীয় রেশম বস্ত্রের চাহিদা কমে যায় ও এই শিল্প অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। কেবল পুরুষানুক্রমিক এই জীবিকা অবলম্বন করে রেশমশিল্পীদের জীনবনির্বাহ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাই তারা বাধ্য হয়ে অন্য দেশে অন্য জীবিকার সন্ধানে যায়।

সুতরাং উপরোক্ত তিনটি অভিলেখ থেকে আমরা গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পেরেছি।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। The Gupta Empire, P.49

২। Select Inscriptions, Vol.I, P.291, f.n.8

গ্রন্থতালিকা ঃ-

১। Banerjee, Manabendu - Historical and Social Interpretations of the Gupta Inscriptions.

২। Raychaudhuri, H.C. – Political History of Ancient India with com mentary by B.N. Mukherjee.

৩। Sircar, D.C – Select Inscriptions, Vol.I, 2nd edition.

৪। চক্রবর্তী, রনবীর - প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।